আল-মুলকঃ ১ম রুকু (১-১৫)আয়াত সমূহ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ۙ تَبٰرَکَ الَّذِیۡ بِیَدِہِ الۡمُلۡکُ ۫ وَ ہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُۨ ৬৭:১

১. বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

تَبَارَكَ শব্দটি بَرَکَة থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হল বর্ধনশীল ও বেশী হওয়া। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর বহু উর্ধ্বে ও উচ্চে।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

জেনে রাখো, সৃষ্টি তারই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক। আরাফঃ ৫৪

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি এ ফুরকান যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়৷ তারঁ বান্দার ওপর নাযিল করেছেন। ফুরকানঃ১

تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি চাইলে তাঁর নির্ধারিত জিনিস থেকে অনেক বেশী ও উৎকৃষ্টতর জিনিস তোমাকে দিতে পারেন, (একটি নয়) অনেকগুলো বাগান যেগুলো পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বড় বড় প্রাসাদ৷ ফুরকানঃ ৯

মূলে تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে৷ এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন৷ এর শব্দমূল রয়েছে ب - ر - ك অক্ষরত্রয়৷ এ থেকে بَرَكَة ও بُرُوك দু’টি ধাতু নিষ্পন্ন হয়৷

بَرَكَة এর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা, প্রাচুর্যের ধারণা৷

আর بُرُوك এর মধ্যে স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্যতার ধারণা রয়েছে৷ তারপর এ ধাতু থেকে যখন تَبَارَكَ এর ক্রিয়াপদ তৈরী করা হয় তখন تفاعل এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর মধ্যে বাড়াবাড়ি , অতিরঞ্জন ও পূর্ণতার প্রকাশের অর্থ শামিল হয়ে যায়৷ تَفَاعل এর স্বীগা (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) অনেক ও আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়।

এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় চরম প্রাচুর্য , বর্ধমান প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থায়িত্ব। এ শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কোন জিনিসের প্রাচুর্য বা তার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য বলা হয়ে থাকে। যেমন কখনো এর অর্থ হয় উচ্চতায় অনেক বেশী এগিয়ে যাওয়া। বলা হয়, تبارکت النخلة অর্থাৎ অমুক খেজুর গাছটি অনেক উঁচু হয়ে গেছে।

কখনো মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে বেশী অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে এ শব্দটি বলা হয়। কখনো একে ব্যবহার করা হয় দয়া ও সমৃদ্ধি পৌঁছানো এবং শুভ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রসরতার জন্য।

কখনো এ থেকে পবিত্রতার পূর্ণতা ও চূড়ান্ত বিশুদ্ধতার অর্থ গ্রহণ করা হয়। এর স্থায়িত্ব ও অনিবার্যতার অর্থের অবস্থাও একই। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং পূর্বাপর বক্তব্যই বলে দেয় কোথায় একে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে তাকে দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে বুঝা যায় , এ ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য تَبَارَكَ শব্দটি এক অর্থে নয় বরং বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

এক : মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ। কারণ , তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের মহান নিয়ামত দান করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

দুই : বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানীয় । কারণ , পৃথিবী ও আকাশে তাঁরই রাজত্ব চলছে।

তিন : বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন । কারণ , তাঁর সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই। ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তাঁর কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই। কাজেই তাঁর স্থলভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই।

চার : বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ । কারণ , সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কতৃর্ত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই।

পাঁচ : শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী।

ফুরকানঃ ৯ আয়াতে আবার সেই একই تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে একথা জানা যাচ্ছে যে , এখানে এর মানে হচ্ছে "বিপুল সম্পদ ও উপকরণাদির অধিকারী ," "সীমাহীন শক্তিধর" এবং "কারো কোন কল্যাণ করতে চাইলে করতে পারেন না , এর অনেক উর্ধ্বে। "

الَّذِىۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَيٰوةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفُوۡرُ

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পর্যক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বেশ কিছু সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে।

প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও না।

দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, সৃষ্টা তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র। মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে।

তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য স্রষ্টা সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। সে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন।

চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল -মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে , তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি?

পঞ্চম বিষয়টি পরীক্ষা কথাটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। তোমরা আমার নিকট প্রর্ত্যাবর্তন করবে না। সত্যিকার বাদশা আল্লাহ মহান হোন। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই; যিনি মহান আরশের অধিপতি।”[সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১১৫, ১১৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমান-জমিন এবং এ দুইটির মাঝে যা কিছু আছে সে সব আমি তামাশা করে সৃষ্টি করিনি।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১৬]

আল্লাহ্ আরও বলেন: ‘‘আমি আসমান-জমিন আর এ দুটির মাঝে যা আছে সে সব তামাশা করে সৃষ্টি করিনি। আমি ও দুটিকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।’’[সূরা দুখান, আয়াত: ৩৮, ৩৯]

তিনি আরও বলেন: ‘‘হা-মীম। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। কাফেরদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’’[সূরা আহকাফ, আয়াত: ১-৩]

এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর প্রভাব ফুটে উঠে। যেমন-‘আল-রহমান’, ‘আল-গফুর’, ‘আল-হাকিম’, ‘আল-তাওয়াব’, ‘আল-রহীম’ ইত্যাদি আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম।

সবচেয়ে যে মহান উদ্দেশ্য ও মহা পরীক্ষার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে- তাওহীদ বা নিরংকুশভাবে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করা। আল্লাহ্ নিজেই মানুষ সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ‘‘আমি জিন্ন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ‘ইবাদাত করবে।’’[সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন:

অর্থাৎ আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদেরকে আমার ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করার জন্য; তাদের প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতার কারণে নয়। আলি বিন আবু তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘‘একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য’’ অর্থাৎ যাতে তারা ইচ্ছাই বা অনিচ্ছায় আমার ইবাদতের স্বীকৃতি দেয়। এটি ইবনে জারীরের নির্বাচিত তাফসির। ইবনে জুরাইয বলেন: যাতে তারা আমাকে চিনে। আল-রাবি বিন আনাস বলেন: ‘‘একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য’’ অর্থাৎ ইবাদতের জন্য। সমাপ্ত [তাফসিরে ইবনে কাছির (৪/২৩৯)]

আল্লাহ্‌র পছন্দের বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘‘আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন, তখন তাদেরকে বিপদ দেন ও পরীক্ষা করেন’’[সুনান ইবনে মাজাহ:৪০২১, হাসান] । যেসব কারণে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন সেগুলো হলো:

এক. পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে চান কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। কুরআনে এসেছে, আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। [সূরা আনকাবুত- ০২]।

দুই. আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার মাধ্যমে মর্যাদার তারতম্য নির্ধারিত করেন। এ বিষয়ে কুরআনে এসেছে, আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে জমিনের খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আনআম-১৬৫)

তিন. পরীক্ষার মাধ্যমে কারা মুমিন এবং কারা মুনাফিক তা বের করা সম্ভব। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, আর কিছু লোক আছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি’, অতঃপর যখন আল্লাহর ব্যাপারে তাদের কষ্ট দেয়া হয়, তখন তারা মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর আজাবের মতো গণ্য করে। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে কোনো বিজয় আসে, তখন অবশ্যই তারা বলে, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম’। সৃষ্টিকুলের অন্তরসমূহে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত নন? আর আল্লাহ অবশ্যই জানেন, কারা ঈমান এনেছে এবং তিনি মুনাফিকদেরকেও জানেন। (আনকাবুত- ১০-১১)।

চার. কারা ভালো আর কারা খারাপ তা বের করার জন্য পরীক্ষা করে থাকেন। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে। (আল ইমরান -১৭৯)।

পাঁচ. পরীক্ষার অন্যতম কারণ হলো মুজাহিদদের মধ্যে ধৈর্যশীলদেরকে বাছাই করা। কুরআনে এসেছে, যদি তোমাদেরকে কোনো আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি এবং যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না। (মুহাম্মাদ-৩১)।

ছয়. শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাহদের পরীক্ষা করে থাকেন : কুরআনে এসেছে, যদি তোমাদেরকে কোনো আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি এবং যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না। (আলে ইমরান-১৪০)।

সাত. যুগ যুগ ধরে হক প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল ধ্বংস করার জন্য ইমানদানদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা বলেন, যাতে তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণিত করেন এবং বাতিলকে বাতিল করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে। (আনফাল-৮)।

তাই প্রত্যেক ইমানদার বান্দাহকে যে কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, অর্থ: নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মতো কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, ‘কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে’? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (বাকারা-২১৪)।

ۨ الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ ۙ هَلۡ تَرٰی مِنۡ فُطُوۡرٍ

ثُمَّ ارۡجِعِ الۡبَصَرَ کَرَّتَیۡنِ یَنۡقَلِبۡ اِلَیۡکَ الۡبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِیۡرٌ

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি?

৪. তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে।

আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এমন কোন স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও৷ রাদঃ২

তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন ৷ তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন ৷ বাকারাঃ২৯

আর আমি তোমাদের ওপর সৃষ্টি করেছি সপ্তপথ" (সূরা আল মুমিনূন, ১৭)

"আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপর মজবুত সপ্ত আকাশ" (সূরা নাবা ১২)

সম্ভবত পৃথিবীর বাইরে যতগুলো জগত আছে সবগুলোকেই আল্লাহ সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন অথবা এই বিশ্ব-জাহানের যে স্তরে পৃথিবীর অবস্থিতি সেটি সাতটি স্তর সমন্বিত ৷

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:::

আসমানের এই স্তরসমূহ অকল্পনীয় স্থান জুড়ে আছে।

১. মহাশূন্যের যে ক্ষেত্র সৌরজগত দ্বারা গঠিত, এটা প্রথম আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম আসমান স্তরের পুরুত্ব আনুমানিক ৬.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার।

২. 'মিল্কিওয়ে' বা আকাশগঙ্গার চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের ছায়াপথের এই বিস্তৃত ক্ষেত্র, এটা দ্বিতীয় আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বিতীয় স্তর তথা আমাদের ছায়াপথের ব্যাস হল ১৩০ হাজার আলোকবর্ষ।

৩. ছায়াপথসমূহের 'Local Cluster' মহাকাশীয় ক্ষেত্র, এটি তৃতীয় আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে। তৃতীয় স্তরের বিস্তার ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

৪. ছায়াপথসমূহের সমন্বয়ে গঠিত মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় চৌম্বক ক্ষেত্র, এটা চতুর্থ আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে। চতুর্থ স্তরের ব্যাস ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

৫. অতি দূর থেকে আগত আলোকতরঙ্গের উৎসসমূহের প্রতিনিধিত্বকার

ী মহাজাগতিক বলয় পঞ্চম আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে। পঞ্চম স্তরটি ১ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে।

৬. মহাবিশ্বের প্রসারমান ক্ষেত্র ষষ্ঠ আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে। ষষ্ঠ স্তরটি অবস্থিত ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে।

৭. মহাবিশ্বের প্রান্তহীন অসীমত্বের নির্দেশক সর্ববহিরস্থ ক্ষেত্র সপ্তম আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে। একথা বলা বাহুল্য যে, সপ্তম স্তরটি বিস্তৃত হয়ে আছে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত।

.

যদি আরাক দলে ব্যাখ্যা দেখেন,

i. ট্রাপোস্ফিয়ার,

ii. স্ট্রাটোস্ফিয়ার,

iii. ওযনোস্ফিয়ার,

iv. মেসোস্ফিয়ার,

v. থার্মোস্ফিয়ার,

vi. আয়নোস্ফিয়ার,

vii. এক্সোস্ফিযার।

“আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং তাদের মত পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তার নির্দেশ; যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।” [সূরা আত-তালাকঃ ১২]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত আসমান ও এর ভিতরে যা আছে এবং এর মাঝখানে যা আছে তা সবই কুরসীর মধ্যে যেন বিস্তীর্ণ যমীনের মধ্যে একটি আংটি আর কুরসী হলো মহান আরশের মধ্যে তদ্রূপ একটি আংটি স্বরূপ যা এক বিস্তীর্ণ যমীনে পড়ে আছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আরশ তার পরিমাণ তো মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ নির্ধারণ করে বলতে পারবে না। [তাবারী]

وَ لَقَدۡ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡیَا بِمَصَابِیۡحَ وَ جَعَلۡنٰهَا رُجُوۡمًا لِّلشَّیٰطِیۡنِ وَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ السَّعِیۡرِ

৫. আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্ৰদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

এখানে নক্ষত্র সৃষ্টির দু’টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ আসমানের সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা, তা প্রদীপের মত দীপ্তিমান সুন্দর দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ শয়তানদল যখন আসমানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন একে উল্কারূপে তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

এর তৃতীয় উদ্দেশ্য যেটাকে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, তার দ্বারা সমুদ্রে ও স্থলে পথ ও দিক নির্ণয় করা হয়।

কুর’আনের অন্যত্র---

আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত রেখেছি। এ শয়তানরা উর্ধ জগতের কথা শুনতে পারে না, সবদিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত ও তাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবুও যদি তাদের

কেউ তার মধ্য থেকে কিছু হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয় তাহলে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পেছনে ধাওয়া করে৷ আস সাফফাতঃ৬-১০

আসমানে আমি গ্রহ-নক্ষত্র (বুরুজ) সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য। আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ চুরি করে (খবর) শুনতে চাইলে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা (শিহাবুম মুবিন) তার পশ্চাদ্ধাবণ করে।(সুরা হিজর ১৫ : ১৬-১৮)

আর নিশ্চয় আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম যে, তা কঠোর প্রহরী এবং জ্বলন্ত শিখা (শুহুব) দ্বারা পরিপূর্ণ। আমরা (আগে) সংবাদ শোনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে (শিহাবার রাসাদা) লুকিয়ে থাকতে দেখে।(সুরা জিন ৭২ : ৮-৯)

উল্কাপাত নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা

রাতের আকাশে অনেক সময় নক্ষত্রের মতো ছোট আলোর ঝলকানি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে দেখা যায়। ওই বস্তুগুলোকে উল্কা বলা হয়। অনেকের কাছে তা 'তারা খসা' বা 'ছুটন্ত নক্ষত্র' হিসেবে পরিচিত। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, 'উল্কা হলো মহাকাশে পরিভ্রমণকারী কিছু কঠিন পদার্থ, যা আকারে ধূমকেতুর চেয়ে ছোট; কিন্তু অণুর চেয়ে বড়।'

জাহেলি যুগে উল্কাপাতকে অশুভ লক্ষণ মনে করা হতো। সহিহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সাহাবিদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ আকাশে তারকা খসে পড়ে। তিনি সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন, জাহেলি যুগে তারকা খসে পড়া নিয়ে তোমাদের কী ধরনের বিশ্বাস ছিল? সাহাবিরা জবাব দিলেন, আমরা মনে করতাম বিশ্বে কোনো ধরনের অঘটন ঘটবে কিংবা কোনো মহান ব্যক্তি মারা যাবেন বা জন্মগ্রহণ করবেন। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, 'এটা ভ্রান্ত ধারণা। কারো জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য নিক্ষেপ করা হয়।'

উল্কাপাত বিষয়ে এক দল বিজ্ঞান গবেষকের অভিমত হলো, মহাকাশে নানা ধরনের ছোট ছোট বস্তু ভেসে বেড়ায়। এসব বস্তু যখন কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের কাছাকাছি চলে আসে তখন এদের আকর্ষণে বস্তুগুলো এদের দিকে চলে আসে। পৃথিবীর দিকে ছুটে আসা এসব বস্তু যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে এদের সংঘর্ষে এরা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একসময় তাতে আগুন ধরে যায়। রাতের আকাশের এই জ্বলন্ত বস্তুগুলোই উল্কা নামে পরিচিত।

আরেক দল গবেষক মনে করেন, সূর্যের খরতাপে সেসব বাষ্প মাটি থেকে ওপরে ওঠে, তার মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। ওপরে পৌঁছার পর এগুলো সূর্যের তাপ বা অন্য কোনো কারণে অতিরিক্ত উত্তাপের শিকার হয়। এর ফলে এগুলো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। দর্শকরা তা দেখে মনে করে কোনো তারকা খসে পড়েছে।

উল্কাপাত বিষয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা হলো, এটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত শয়তানদের ওপর নিক্ষিপ্ত হয়। আলোচ্য আয়াত থেকে বিষয়টি জানা যায়।

এ ছাড়া সুরা জিনের মধ্যে জিন জাতির ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, ‘আগে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে পূর্ব প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।’ (সুরা : জিন, আয়াত : ৯)

আসলে উল্কাপাত নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা চলমান।

সীমিত অর্থে ‘নাজম’ (বহুবচন 'নুজুম') বিশেষ্যটি দ্বারা সুবিশাল জ্যোতিষ্ককে বোঝানো যেতে পারে যার মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে, যেগুলো জ্বলছে এবং যেগুলোর নিজস্ব আলো আছে। যেমনঃ সূর্য। আর ‘كوكب’ (কাওকাব) বিশেষ্য (বহুচন 'কাওয়াকিব') দ্বারা কঠিন জ্যোতিষ্ককে বোঝায় যেগুলো জ্বলন্ত নয় (বা নিজস্ব আলো নেই)। যেমনঃ সৌরজগতের গ্রহগুলো। এগুলো আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষা।

وَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

৬. আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; এবং তা কত মন্দ ফিরে যাওয়ার স্থান!

কুফরের আসল মানে হচ্ছে গোপন করা,লুকানো । এ থেকেই অস্বীকারের অর্থ বের হয়েছে । ঈমানের বিপরীত পক্ষে এ শব্দটি বলা হয় । ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, স্বীকার করা৷ এর বিপরীতে 'কুফর'- এর অর্থ না মানা , প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা । কুরআনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফরীর মনোভাব ও আচরণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে ।

এক:আল্লাহকে একেবারেই না মানা । অথবা তাঁর সার্বভৌম কতৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার না করা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক ও মাবুদ বলে না মানা ।

দুই:আল্লাহকে মেনে নেয়া কিন্তু তাঁর বিধান ও হিদায়াতসমূহকে জ্ঞান ও আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা ।

তিন:নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বাণীসমূহ যেসব নবী-রসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্বীকার করা ।

চার:নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দলীয়প্রীতির কারণে তাদের মধ্য থেকে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা ।

পাঁচ: নবী ও রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদা-বিশ্বাস , নৈতিক চরিত্র ও জীবন যাপনের বিধান সম্বলিত যেসব শিক্ষা বিবৃত করেছেন সেগুলো অথবা সেগুলোর কোন কোনটি গ্রহণ করা ।

ছয়:এসব কিছুকে মতবাদ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কার্যত জেনে বুঝে আল্লাহর বিধানের নাফরমানী করা এবং এই নাফরমানীর ওপর জোর দিতে থাকা । আর এই সংগে দুনিয়ার জীবনে আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর নিজের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপন করা ।

আল্লাহর মোকাবিলায় এসব বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও কাজ মূলত বিদ্রোহাত্মক । এর মধ্য থেকে প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকে কুরআন কুফরী হিসেবে চিহ্নত করেছে । এ ছাড়াও কুরআনের কোন কোন জায়গায় 'কুফর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহর দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার অর্থে । সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতার বিপরীতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে । 'শোকর' –এর অর্থ হচ্ছে , যিনি অনুগ্রহ করেছেন তাঁর প্রতি অনুগৃহীত থাকা , তাঁর অনুগ্রহকে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দান করা, তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহকে তাঁর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করা এবং অনুগৃহীত ব্যক্তির মন অনুগ্রহকারীর প্রতি বিশ্বস্ততার আবেগে পরিপূর্ণ থাকা৷ এর বিপরীত পক্ষে কুফর বা অনুগ্রহের প্রতি অকৃজ্ঞতা হচ্ছেঃ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং এই অনুগ্রহকে নিজের যোগ্যতা বা অন্য কারোর দান বা সুপারিশের ফল মনে করা অথবা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ প্রদান করা সত্তেও তার সথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা৷ এই ধরনের কুফরীকে আমরা নিজেদের ভাষায় সাধারণত কৃতঘ্নতা, অকৃতজ্ঞতা, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি ।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِىَ تَفُوْرُ

৭. যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে(১), আর তা হবে উদ্বেলিত।

মূল ইবারতে شَهِيق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী] এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে।

"হতভাগ্যরা জাহান্নামে যাবে (যেখানে অত্যধিক গরমে ও পিপাসায়) তারা হাঁপাতে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে"। সূরা হুদঃ১০৬

আগুন যখন দূর থেকে এদের দেখবে তখন এরা তার ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবে। ফুরকানঃ১২

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মারণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করেছেন।

সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। মানুষ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যাণ-ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষে ভবিষ্যত নির্ভর করছে। নবী-রাসূলদের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানার ওজর পেশ করতে পারে না। তাকে না জানিয়ে অলক্ষেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকবে না।

"প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে

ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়। মতভেদ তারাই করেছিল যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও কেবলমাত্র পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে।

--- কাজেই যারা নবীদের ওপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দিয়েছেন,যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।" বাকারাঃ২১৩

হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে কি রসূলেরা আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতো এবং এ দিনটির পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সর্তক করতো ? তারা বলবে , হাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছি। আজ দুনিয়ায় জীবন এদেরকে প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে রেখেছে কিন্তু সেদিন এরা কাফের ছিল বলে নিজেরাই বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে। সূরা আন'আমঃ১৩০

যে ব্যক্তিই সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরই বর্তায়। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর আমি (হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) একজন পয়গম্বর না পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না। বনী ইসরাইলঃ১৫

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۚ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ

৯. তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।

তারা বলবে, "তোমাদের রসূলগণ কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেননি ?" "তারা বলবে হ্যাঁ।" জাহান্নামের কর্মকর্তারা বলবেঃ "তাহলে তোমরাই দোয়া করো। তবে কাফেরদের দোয়া ব্যর্থই হয়ে থাকে। সূরা মুমিনঃ৫০

وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ

১০. আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।(১)

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

১১।এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। এ দোযখবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত৷

অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাদের অপরাধের ব্যাপারে নিজেদের উপর দোষ স্বীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে চুড়ান্ত ফয়সালা করা হবে না।" [আবু দাউদ ৪৩৪৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৯৩]

এখানে শোনার কাজেকে বুঝার কাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে৷ তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত। চিন্তা-ভাবনা করে তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে৷ নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক -বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না৷

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

— 'সেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলটপালট করা হবে, তারা বলতে থাকবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ এবং (আল্লাহর) রাসূলের অনুসরণ করতাম। 'তারা বলবে, হে আমাদের

প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। 'হে আমাদের প্রতিপালক!তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে দাও মহা

অভিসম্পাত।[সূরা আহযাব : ৬৬-৬৮]

আর সেদিন অপরাধী নিজের দুই হাত কামড়িয়ে বলবে, 'হায় আমার আফসোস! যদি আমি রাসূলের পথ ধরতাম। হায়! আমার দুর্ভোগ! আমার আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। অবশ্যই সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ বাণী (কুরআন) পৌঁছার পর; আর শয়তান হল মানুষের জন্যে মহাপ্রতারক। আর রসূল বলবে, 'হে আমার রব, অবশ্যই আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল। ফুরকান, ২৫/২৭-৩০

রাসূল সা.ইরশাদ করেন, বিলাসিতা এবং সুখ-শান্তির ভিতর জাহান্নাম আর দুঃখ-বেদনার ভিতর জান্নাত লুকিয়ে রাখা হয়েছে। [মুসলিম]

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

১২) যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরষ্কার৷

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।'-সূরা নাযিআত ৭৯ : ৪০-৪১

তাকওয়া বা খোদাভীতি সম্পর্কে আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।' (হুজরাত ১০)

'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সেসব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর।' (হাশর ১৮)

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' (আল ইমরান ১০২)

'নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী।' (ফাতির ২৮)

'আল্লাহ তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন, যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে।' (নাহল ১২৮)

'আর সফলকাম হবে ওইসব লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে।' (নূর ৫২)

হে মোমিনরা, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।' (সূরা আনফাল : ২৯)।

আল্লাহ পাক আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য একটা পথ করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে দান করেন যা সে কল্পনাও করে না।' (সূরা তালাফ : ২-৩) 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন।' (সূরা তালাক : ৪)।

আতিয়া আস-সাদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা যেসব কাজে গুণাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খোদাভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযি ও ইবনে মাজা)

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে আয়েশা। ছোটখাট গুণাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এ জন্যও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। (ইবনে মাজা)

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণমাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিকপ্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজা)

হাসান ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জবান মুবারক হতে এই কথা মুখস্থ করে নিয়েছি, যে জিনিস সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় তা পরিত্যাগ করে যা সন্দেহের ঊর্ধ্বে তা গ্রহণ কর। কেননা সততাই শান্তির বাহন এবং মিথ্যাচার সন্দেহ সংশয়ের উৎস। (তিরমিযি)

তাকওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা,

১. প্রথমস্তর: কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে থাকা। এই অর্থে একজন সাধারণ মুসলমানকেও মুত্তাকী বলা যাবে, তার থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশ পেলেও। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এই অর্থেও তাকওয়া শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

২. দ্বিতীয়স্তর: আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক অপছন্দনীয় যাবতীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। এমনকি সগীরা গুনাহ থেকেও। এই স্তরের তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই কুরআন হাদিসের বিভিন্ন কল্যাণ ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

৩. তৃতীয়স্তর: অন্তরকে আল্লাহ ব্যতিত যাবতীয় বিষয় থেকে মুক্ত রাখা। এই স্তরের তাকওয়া নবী ও আওলিয়াগণের হয়ে থাকে। আর এটিই তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

'এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।' [সূরা বাকারা, আয়াত: ২]

বিশিষ্ট দার্শনিক ইমাম জাকালি (রা.) বলেন, তাকওয়ার স্তর হচ্ছে চারটি_

* শরিয়ত যেসব বস্তু হারাম করেছে, সেসব বস্তু থেকে বিরত থাকা। যেমন মদ-সুদ, জুয়া, জেনা ব্যভিচার ইত্যাদি। এটা সাধারণ মোমিনের তাকওয়া এ শ্রেণীর মুত্তাকিকে বলা হয় মোমিন।

* হারাম বস্তু থেকে বিরত থাকার পর সন্দেহযুক্ত হালাল বস্তুগুলো থেকে দূরে থাকা। এ শ্রেণীর মুত্তাকিকে বলা কথা হয় সালেহ।

* যাবতীয় হারাম বস্তু ও সন্দেহযুক্ত হালাল বস্তুগুলো থেকে দূরে থাকার পর আল্লাহ তায়ালার ভয়ে অনেক সন্দেহবিহীন হালাল বস্তুও পরিত্যাগ করে_ এ শ্রেণীর লোককে বলা যায় মুত্তাকি।

* উপরোলি্লখিত তিন শ্রেণীর তাকওয়া আয়ত্ত করার পর এমনসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা, যা ইবাদতে কোনোরূপ সহায়তা করে না। এ শ্রেণীর মুত্তাকিকে বলা হয় সিদ্দিক।

তাকওয়ার রুপভেদে প্রকারঃ

নীচের সূরা আরাফ (২০১-২০২) আয়াত থেকে দুই ধরনের অবস্থা জানা যায়।

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾

২০১) প্রকৃতপক্ষে যারা মুক্তাকী, তাদেরকে যদি কখনো শয়তানের প্রভাবে অসৎ চিন্তা স্পর্শও করে যায় তাহলে তারা তখনই সতর্ক হয়ে উঠে তারপর তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি পরিষ্কার দেখতে পায়৷

﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾

২০২) আর তাদের অর্থাৎ (শয়তানের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে তাদের বাঁকা পথেই টেনে নিয়ে যেতে থাকে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তারা কোন ত্রুটি করে না৷

আল্লাহ তাআলা এ দুই আয়াতে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ও 'ইখওয়ানুশ শায়াতীন'-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অন্য ভাষায় বলা যায়, 'ইবাদুর রাহমান' ও 'ইবাদুশ শাইতান' তথা আল্লাহর বান্দা ও শয়তানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

'ইবাদুর রাহমান'আবার দুই মান থাকেঃ

১ম মানঃ গোনাহ ত্যাগ করা

গুনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গুনাহ ত্যাগ করা তাকওয়ার একটি প্রকার। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে মুত্তাকী হিসাবে গণ্য। যেমনঃ

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।'-সূরা নাযিআত ৭৯ : ৪০-৪১

২য় মানঃ গোনাহ হয়ে গেলে ফিরে আসা

আল্লাহকে স্মরণ করার দ্বিতীয় পর্যায় হল গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর স্মরণ করা। মুত্তাকী বান্দার কখনো কোনো গোনাহ হয় না, তা নয়। স্খলন হতে পারে, ভুল হতে পারে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হল, গুনাহ হয়ে গেলে মনে অনুতাপ জাগে, আল্লাহর ভয় জাগে এবং এই উপলব্ধি জাগে যে, আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। আর তখন সে তার করণীয় স্পষ্ট দেখতে পায় যে, আমাকে এই অবস্থা থেকে ফিরতে হবেই। সে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এটিও তাকওয়ার একটি সত্মর এবং মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেখানে আছে-

اَلَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলে জেনে বুঝে তাতে অটল থাকে না।-সূরা আলে ইমরানঃ১৩৫

আল্লাহ পাক রাতের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন দিনের অপরাধী তাঁর দিকে ফিরে আসে। আবার দিনের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন রাতের অপরাধী তাঁর দিকে ফিরে আসে। এবং এভাবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া- অর্থাৎ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাঁর গোনাহগার বান্দাদের জন্য তাঁর দয়া ও করুণা প্রসারিত রাখেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৫৯

আমি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কেউ যখন কোনো গুনাহ করে ফেলে এরপর (তার বোধোদয় হয় এবং সে) উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর নামায পড়ে, এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চায়, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৪০৬

'ইবাদুশ শাইতান'

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১৩) তোমরা নীচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চাস্বরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দু"টো সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন৷

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না? অথচ তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত৷

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন। ' -সূরা ইমরান: ১১৯

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন? (সূরা বাকারাঃ ১৪০)

নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।' (সুরা : মুজাদালা, আয়াত : ১)

ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা।' (সুরা : কাহ্ফ, আয়াত : ২৬)

'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বল, তখন গুণাহ, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের নাফরমানির কথাবার্তা নয়, বরং সৎ কর্মশীলতা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথাবার্তা বল এবং সেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে।' (মুজাদালা ৯)

‘যেসব কাজ পূণ্য ও ভয়মূলক তাতে একে অপরকে সাহায্য কর, আর যা গুণাহ ও সীমা লংঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন।’ (মায়েদা-২)

খোদ সৃষ্টি নিজের সম্পর্কে বেখবর বা অজ্ঞ থাকতে পারে৷ কিন্তু স্রষ্টা তার সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না৷ তোমাদের প্রতিটি শিরা -উপশিরা তিনিই সৃষ্টি করেছেন৷ তোমাদের হৃদপিন্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ূতন্ত্রীও তাঁর সৃষ্টি৷ তোমাদের প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস তিনি চালু রেখেছেন বলেই তা চালু আছে৷ তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ তাঁর ব্যবস্থাপনার অধিনে কাজ করছে৷ তাই তোমাদের কোন বিষয় তাঁর আগোচারে কি করে থাকতে পারে?

এর একটি অর্থ হলো সূক্ষ্ম ও অনুভবযোগ্য নয় এমন পন্থায় কর্ম সম্পাদনকারী এবং আরেকটি অর্থ হলো গোপন তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী৷

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

১৫) তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন৷ তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও৷ আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে৷

কে তিনি যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য আকশ থেকে পানি বর্ষণ করছেন তারপর তার সাহায্যে সদৃশ্য বাগান উৎপাদন করেছেন যার গাছপালাও উৎপন্ন করাও তোমাদের আয়াত্বধীন ছিল না? আল্লাহর সাথে কি (এসব কাজে অংশীদার) অন্য ইলাহও আছে? (না,) বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলছে৷ নমলঃ ৬০

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন অবস্থান লাভের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ নদী এবং তার মধ্যেই গড়ে দিয়েছেন (পর্বত মালার) পেরেক, আর পানির দুটি ভান্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন৷ আল্লাহর সাথে (এসব কাজের শরিক) অন্য কোন ইলাহ আছে কি? না, বরং এদের অধিকাংশই অজ্ঞ৷ নমল-৬১

পৃথিবী যে অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে এটাও কোন সহজ ব্যাপার নয়৷ যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে এ গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিষয়াবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে মানুষ বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারে না৷ সে অনুভব করতে থাকে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ শক্তি

সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এ ভূ-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলছে। কারো উপর ভর দিয়ে অবস্থান করছে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোথাও মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে আসে তাতে গোটা পৃথিবী যদি কোন কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো তাহলে এখনো মানব বসতি সম্ভবপর হতো না। এ গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সামনে আসে আবার পেছন ফেরে। এর ফলে দিনরাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি এর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে ফেরানো থাকতো এবং অন্য দিকটা সব সময় থাকতো আড়ালে তাহলে এখানে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচণ্ড উত্তাপ তাকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণীহীন করে দিতো। এ ভূ-মণ্ডলের পাঁচশো মাইল উপর পর্যন্ত বাতাসের একটি পুরুস্তর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। উল্কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে তা পৃথিবীকে রক্ষা করে। অন্যথায় প্রতিদিন কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড সেকেণ্ডে ৩০ মাইল বেগে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। ফলে এখানে যে ধ্বংসলীলা চলতো তাতে মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা কিছুই জীবিত থাকতো না। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। এ বাতাস না হলে এ পৃথিবী কোন বসতির উপযোগী অবস্থানস্থলে পরিণত হতে পারতো না। এ ভূ-মণ্ডলের ভূ-ত্বকের কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করা হয়েছে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। যেখানে এ জিনিসগুলো থাকে না সেখানকার ভূমি জীবন ধারণের উপযোগী হয় না। এ গ্রহটিতে সাগর, নদী , হ্রদ, ঝরনা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। পাহাড়ের উপরও এর বিরাট ভাণ্ডার ঘনীভূত করে এবং পরে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখানে জীবনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার এ পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব জিনিস পাওয়া যায় সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এ গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ মাধ্যাকর্ষণ যদি কম হতো, তাহলে বাতাস ও পানি উভয়কে এখানে আটকে রাখা সম্ভব হতো না এবং তাপমাত্রা এত বেশী বেড়ে যেতো যে, জীবনের টিকে থাকা এখানে কঠিন হয়ে উঠতো। এ মাধ্যাকর্ষণ যদি বেশী হতো তাহলে বাতাস অনেক বেশী ঘন যেতো, তার চাপ অনেক বেশী বেড়ে যেতো এবং জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হওয়া কঠিন হয়ে পড়তো ফলে বৃষ্টি হতো না, ঠাণ্ডা বেড়ে যেতো, ভূ-পৃষ্টের খুব কম এলাকাই বাসযোগ্য হতো বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের

ওজন এত বেড়ে যেতো যে তাদের পক্ষে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যেতো। তাছাড়া এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দূরত্বে রাখা হয়েছে। যদি এর দূরত্ব বেশী হতো, তাহলে সূর্য থেকে সে কম উত্তাপ লাভ করতো, শীত অনেক বেশী হতো, এবং অন্যান্য অনেক জিনিস মিলেমিশে পৃথিবী নামের এ গ্রহটি আর মানুষের মতো সৃষ্টির বসবাসের উপযোগী থাকতো না। Sisters'Forum In Islam